ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-III, January, 2026, Page No. 495-501
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.03W.236

জয়া মিত্রের ছোটগল্প: নারী জীবনের বহুমাত্রিকতা

সুজিত মণ্ডল, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 19.01.2026; Accepted: 26.01.2026; Available online: 31.01.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Jaya Mitra emerged in the Bengali story world in the eighties of the last century. Her Story world is diverse. Almost all of her stories are written form a woman's perspective. The lives of woman from different classes of society are expressed in her stories. With the changing times, women's lives have progressed, Conscious women are fighting to understand their rights; yet, in the present times, the lives of many women are full of obstacles. The story of victory and defeat in women's lives is expressed in the stories of Jaya Mitra. She did not portray the women in her stories with the idea that women have to endure everything in the world. The women in her stories are independent-minded, self-reliant and rebellious; who try to bring about change in society from within the world. Also in her story, we see that women educated in patriarchal education are the main enemies of women who want to be independent and self-reliant. In the narrow confines of the world, poorly educated, reformed women occupied their dominance. For generations, the life of a woman in a cycle has been revolving. The women in her stories try to overcome time and society by clinging to them. Jaya Mitra's story is an unheard-of story of the painful lives of tireless female soliders in the war called duty in a helpless, deprived and degraded world.

Keywords: Jaya Mitra, Short Story, Patriarchy society, women, Multidimensionality

বাংলা গল্পভুবনে জয়া মিত্রর আবির্ভাব বিগত শতাব্দীর আশির দশকে। কবি, গল্পকার, ঔপন্যাসিকের পাশাপাশি তিনি সমাজকর্মী, পরিবেশবিদ এবং একসময় ছিলেন রাজনীতির সক্রিয় কর্মী। রাজনীতির কারণে তিনি সাড়ে চারবছর জেলবন্দী ছিলেন। জেল জীবনের অভিজ্ঞতাকে পুঁজি করে তিনি লেখেন 'হন্যমান' (১৯৮৯) উপন্যাস। বাঙালি পাঠকমহলে অভূতপূর্ব সাড়া জাগানো এই উপন্যাসের জন্য তিনি আনন্দ পুরস্কারে (১৯৯২) ভূষিত হন। বর্ণময় ব্যক্তিজীবনের মতো তাঁর গল্পবিশ্বও বৈচিত্র্যময়। তাঁর প্রায় গল্প নারীর দৃষ্টিকোণে রচিত। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির নারীর জীবনকথা ব্যক্ত হয়েছে তাঁর গল্পে। সংসারে নারীদের সবই সহ্য করে নিতে হয় এই ধারণায় তাঁর গল্পের নারীদের তিনি চিত্রিত করেননি। তাঁর গল্পের নারীরা স্বাধীনচেতা, অস্মিতাবোধসম্পন্ন, প্রতিবাদী; যারা সংসারের মধ্যে থেকে সমাজে পরিবর্তন আনার চেষ্টা করে। সমাজকর্মী বা রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন প্রান্তে তিনি ঘুরেছেন। তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন নারীর শোষণ-বঞ্চনা এবং প্রতিবাদীসত্তাকে। বাস্তব সেই অভিজ্ঞতাকে কল্পনার জারক রসে মিশিয়ে নারীজীবনকে তিনি গল্পে চিত্রিত করেছেন।

জয়া মিত্রর গল্পের নারীরা জননী-জায়া-কন্যারূপে চিত্রিত। তাঁর গল্পে দেখি, মাতৃত্বে নারী সর্বংসহা, সেই জননীই সন্তানের বিপদাপন্নে রণংদেহী, সর্বনাশিনী। 'কুরুক্ষেত্রের আগে' গল্পে বর্ণিত হয়েছে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে জননীর লড়াকু যোদ্ধাসুলভ মানসিকতা। নেশাগ্রস্ত স্বামীর দায়িত্বহীনতার কারণে সংসারের সকল দায় মণিমালার। মাকড়সার জালের মতো সংসারের জালে জর্জরিত মণিমালা অকালবার্ধক্যে ভোগে। তারপরেও সে মাতাল স্বামীর হাতে নির্যাতীতা-

> "মদের নেশায় চুর হয়ে এসে রান্না হয়নি দেখলে মণিমালার চুলের মুঠিধরা, পয়সা উপার্জনের নানারকম উপায়ের কথা বলে দেওয়া – এসবই ঘটেছে। ছেলেমেয়ের সামনে।"[১]

মাতৃত্ব মণিমালাকে সহিষ্ণুতার শক্তি দিয়েছে। সন্তানকে সুন্দর জীবনদানে বদ্ধপরিকর মণিমালার লড়াই সংসারের অন্যায়-অত্যাচার, প্রতিবন্ধকতার সঙ্গে। মণিমালার ধৈর্যচ্যুতি ঘটে যখন স্বামী ঋণের দায় থেকে বাঁচতে স্ত্রী ও কন্যার শরীরের সওদা করে। স্ত্রী-কন্যাকে কামান্ধ পশুদের সামনে মাংসের টোপ হিসেবে ব্যবহার বিকৃত মানসিকতার পরিচয়-

> "বোধহয় কোনো অলিখিত বদলাবদলির সমঝোতা হয়ে গেছে। বাইরে বাইরে হয়েছে সেটা। সে আর তার মেয়ে সেই খেলায় একটা মাংসের টুকরো, একটা টোপ মাত্র। যেটা দেখিয়ে কুকুরের মুখ চুপ করিয়ে রাখা হয়।"[২]

বিকৃত মানসিক ব্যক্তির স্ত্রীর পরিচয় থেকে বৈধব্য জীবন কাম্য মণিমালার। সন্তানের কথা ভেবে স্বামীকে ত্যাগ করে মণিমালা নবজীবনের উদ্দেশে অজানা ভবিষত্যের পথে পা রাখে।

পুরুষতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধ লড়াইয়ে জননীর জয়গানের আরেকগল্প 'অন্ধকারের উৎস থেকে' (১৯৮৮)। বারো বছরের শান্তাবালাকে তাঁর পিতা অর্থের লোভে মধ্যবয়সী দোজবর হরিধন কুঁইলার সঙ্গে বিবাহ দেয়। 'মেয়ের নাম দেলি, যমকে দিলেও গেলি জামাইকে দিলেও গেলি' আপ্তবাক্য সত্য হয় শান্তাবালার জীবনে। তার কাছে স্বামী অর্থ যৌননির্যাতন ও শারীরিক অত্যাচার করা ব্যক্তি। স্বামীর লালসার কারণে তের বছরের দাম্পত্যজীবনে সে নয়বার গর্ভবতী হয়েছে। নয়বার গর্ভবতী হলেও পাঁচটি সন্তান মারা যায়, চার সন্তানের মধ্যে শান্তার চিন্তা দুই মেয়ে যামিনী-কামিনীকে ঘিরে। সে চায়নি 'মেয়ের নাম দেলি' বাক্য সত্য হোক তার মেয়েদের জীবনে। বিবাহের পর জীবনের আনন্দ-দুঃখের কথা চিঠি লিখে জানানোর মতো মেয়েদের সুশিক্ষিত করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ শান্তাবালা। কিন্তু হরিধন দুই মেয়ের বিবাহ ঠিক করায় শান্তার পরিকল্পনা মুহূর্তে ধূলিসাৎ হয়। শান্ত, ভীতু স্ত্রী হয়ে দাম্পত্যজীবনে স্বামীর কথাকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করলেও সন্তানের সংকটে স্পর্ধিত শান্তাবালা স্বামীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করে- "অতটুকু মেয়ের আমি বে দেবনা। যামিনী কামিনীকে আমি ইস্কুলে পাঠাব। মানুষ করব।"[৩] আসন্ন বিপদ থেকে মেয়েদের বাঁচাতে নারীর জড়ত্বের খোলস ছেড়ে জননী শান্তাবালা অদম্য সাহসিকতার পরিচয় দেয়-

> "বহু বছর ধরে চোখের সামনে থাকা কাঠ চেলা করার কুড়লটা রাত্রে ঘুমন্ত হরিধনের মাথায় গায়ের জোরে বসিয়ে দেয়।"[৪]

খুন করার পর নির্ভীক, দৃড়প্রতিজ্ঞ শান্তা নিজের গচ্ছিত সোনার গয়না প্রতিবেশী রোহিণীর হাতে তুলে দিয়েছে যামিনী-কামিনীকে সুশিক্ষিত করতে। অপরাধ করছে জেনে শাস্তির জন্য শান্তা থানায় আত্মসমর্পণ করে। মাতৃত্বের কারণে শান্তাবালার অন্ধকার জীবনে আলোর নির্গমন ঘটে। সেই আলোয় তার মুক্তির আলো।

জয়া মিত্রর গল্পের নারীরা পুরুষতন্ত্রের বিধিনিয়মের যূপকাষ্ঠে নিজেকে বলি দেয় না, ছককাটা জীবনের বাইরে গিয়ে নারীরা প্রতিবাদী। তেমনই এক গল্প 'ছকের বাইরে'। স্পষ্টবক্তা, প্রাণচঞ্চল, স্বাধীন চিন্তাভাবনা পোষণ করা রুক্মিণীকে নিয়ে পরিবারের চিন্তা বিবাহের পর শ্বশুরবাড়িতে কি করে মানিয়ে নেবে। রুক্মিণীর

সঙ্গে কলেজে আলাপ হয় জয়ন্তর। আলাপ প্রেমে পরিণতি পায়। কলেজ শেষে দুই পরিবারের সম্মতিতে বিবাহের স্থির হয়। ছন্দ কাটে বিবাহে জয়ন্তর পরিবারের পণের দাবিতে-

> "জয়ন্তর বাবা পঞ্চাশ হাজার টাকা চাইলেন আর ছেলের জন্য একখানি স্কুটার। বললেন এটা পণ নয়। বৌভাতের তো একটা খরচ আছে। আমাদের আত্মীয়স্বজন অনেক।"[৫]

পণে পরিবারের সম্মতি থাকলেও বিবাহে তীর্ব আপত্তি জানায় রুক্মিণী। রুক্মিণীর বিশ্বাস, টাকায় কেনা বাড়ি ভাড়া বাড়ি, নিজের বাড়ি নয়। সে লজ্জিত কারণ, একজন অমেরুদণ্ডী, দুর্বল ছেলেকে ভালোবেসেছে; যে পিতামাতার অন্যায় দাবি জেনেও নিশ্চুপ ছিল। পণপ্রথার মতো সামাজিক ব্যাধিকে সমর্থন করা ছেলের সঙ্গে সারাজীবন কাটানো তার পক্ষে অসম্ভব। দুই পরিবারের জোরাজুরিতে রুক্মিণী একটাই শর্তে বিবাহে রাজী হয়, বিবাহের পর জয়ন্তকে শ্বশুরবাড়িতে বাস করতে হবে। দীর্ঘদিনের প্রেমিককে হারিয়ে মানসিক যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত হলেও পণপ্রথা ও পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বদ্ধ নীতি নিয়মের কাছে নিজের নীতি-আদর্শকে বিসর্জন দেয়নি। পিতৃতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে একা নারী অসহায় নয়, প্রতিবাদী নারী সমাজের স্থবির নিয়মের পরিবর্তন আনার কথা বলে।

জয়া মিত্রর গল্পের নারীরা সংসারে অবহেলিত, অপমানিত হয়ে পরমুখাপেক্ষী জীবন কাটাতে চায় না। আত্মমর্যাদাসম্পন্ন নারীরা সম্মানের সঙ্গে বাঁচতে অশান্তময় দাম্পত্যজীবন ভেঙে একাকী বাঁচতে সাবলীল। 'কাল পরশুর ধারাবাহিক' (১৯৮৬) গল্পে পরস্পরের বিপরীত স্বভাবের সুধন্য ও শ্রীলার বৈবাহিক জীবন শুরু থেকেই বেসুরো। একই ছাদের নীচে মানিয়ে চলার চেষ্টা করলেও সময়ের সঙ্গে দাম্পত্য অশান্তি বাড়তেই থাকে। দাম্পত্য সংঘাত প্রবল হয় কন্যা সন্তানের জন্মে। সুধন্যর বিশ্বাস, কন্যাসন্তান স্ত্রীর সময় কাটানোর 'জিনিস'। সুধন্য স্ত্রীর সম্মুখেই নেশা, বান্ধবীর সঙ্গে পরকীয়ায় মেতে ওঠে। পিতামাতার অশান্ত পরিবেশের মধ্যে মেয়েকে বড় করতে চায়নি শ্রীলা। স্বামীনির্ভর জীবন ছেড়ে স্বনির্ভরতার জন্য চাকরির সন্ধানে শ্রীলার বাইরে জগতে পা রাখায় প্রবল আপত্তি সুধন্যর। আত্মমর্যাদার সঙ্গে স্বাধীন, স্বনির্ভরশীল হয়ে বাঁচার তাগিদে শ্রীলা দাম্পত্য সম্পর্কে ভেঙে একাকী নবজীবনের পথ চলা শুরু করে। বর্তমানে শ্রীলা স্বামীর পরিচয়ে পরিচিত নয়, দীর্ঘ সংগ্রামের পর সমাজে প্রখ্যাত সমাজসেবী হিসেবে নিজস্ব পরিচয় গড়ে তুলেছে।

আবার লেখিকার গল্পের আধুনিক নারীরা নিজেদের জীবনের রাশ অন্যের হাতে দিতে অনিচ্ছুক। প্রগতিশীল নারী নিজের জীবনকে স্বনিয়ন্ত্রিত করতে চায়। 'নিয়ন্ত্রণের অধিকার' (১৯৯৭) গল্পে মেয়েটি নিজের জীবনে অন্যের কর্তৃত্ব মানতে নারাজ। মেয়েটি কেরিয়ার, ভালোলাগা, প্রেম, বিবাহ এমনকি যৌনতা বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে সিদ্ধান্ত নিতে চায়। আমাদের মনে হতে পারে লেখিকার গল্পের আধুনিক নারীরা উগ্র নারীবাদের ভাবনায় বিশ্বাসী। এ ভাবনা সম্পূর্ণ ভুল, তাঁর গল্পের আধুনিক নারীরা উচ্ছৃঙ্খল নয় বরং নারীরা জীবন সম্পর্কে আত্মসচেতন।

জয়া মিত্র সত্তর দশকে নকশাল আন্দোলনের একজন সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী ছিলেন। রাজনীতির কারণে তিনি পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে পা রেখেছেন। প্রত্যক্ষ করেছেন পার্টির মহিলা রাজনৈতিক কর্মীদের। রাজনীতির অঙ্গনে সেইসব লড়াকু নারীদের কথা পাই জয়া মিত্রর গল্পে। সংসার হোক বা রাজনীতির ময়দান উভয়ক্ষেত্রেই নারী স্বাচ্ছন্দ্যময়ী। সেই ভাবনায় প্রতিফলিত হয়েছে 'শেল্টার' (১৯৯৫) গল্পে। স্বামীর চাকরির সূত্রে পাণ্ডববর্জিত স্থানে চার ছেলেমেয়ে ও 'হাঁড়ি-হেঁসেল' নিয়েই দিন কাটে সরস্বতীর। চার দেওয়ালের মধ্যে একঘেয়েমির জীবনে মুক্তির অন্বেষণ করে সরস্বতী। সরস্বতীর কাছে, মেয়ে হয়ে জন্মানো অভিশাপের-

> "জানো না তো মেয়েজন্ম কত যে কঠিন। প্রেম করেই হোক বা সম্বন্ধ করেই হোক, বিয়ে হয়ে একবার এসে ঢুকলে আর বাকি সব রাস্তা বন্ধ। দু-দিন আগেই হোক বা পরেই হোক। নিজের অতীতের আর কোন পরিচয়ই থাকবে না কোথাও। কখনো যে গান গাইতাম, পড়াশুনা করতে ভালোবাসতাম, লোকজন হাসিখুশি – সমস্ত ভুলে গেছি। এই দামাল বাচ্চাদের সামলে বড়ো করতে থাকা, রান্না সেলাই ঘর পরিস্কার আর যে ওঁর মনে হল কাছে যাওয়া, ভয়ে লজ্জায় মরি, যদি ছেলেরা জেগে ওঠে। কিছু বলবার সাহস হয় না।"[৬]

আত্মসুখ বিসর্জন দিয়ে সন্তান সামলানো আর বিছানায় স্বামীর যৌনলালসা মেটানোয় ছিল সরস্বতীর জীবন। গল্পে নন্দিতা চরিত্রটি সরস্বতীর সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্রের। নন্দিতা নকশাল কর্মী। পুলিশের নজর এড়াতে সে আশ্রয় নেই সরস্বতীর বাড়ির পাশে। দুই নারীর মধ্যে গড়ে ওঠে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক। সরস্বতীর জীবনে কিছু না হতে পারার আক্ষেপগুলো পরিপূর্ণতা খুঁজে পায় নন্দিতার মধ্যে। গোপন আস্তানা বদলের দিন নন্দিতাকে স্মৃতিস্বরূপ সরস্বতী শাড়ি উপহার দেয়-

> "তুমি কাল না হয় পড়ে যেও। আমার বড্ড ভালো লাগবে যে আমি যেমন হতে পারিনি একজন তেমনি হয়েছে। এই শাড়িটা তোমার কাছে থাকলে মনে হবে আমি একটু একটু তোমার কাছে আছি।"[৭]

আমাদের সমাজে বহু নারীকে পরিস্থিতির চাপে অসহায়, নিরুপায় হয়ে চার দেওয়ালের মধ্যে বন্দী থাকতে হয়। সংসারের চৌহদ্দির মধ্যে আটকে থাকলেও প্রতিটি নারীর মনে থাকে লড়াকু মানসিকতা।

'স্বজন-বিজন' (১৯৮৭) গল্পটিও রাজনৈতিক পটভূমিতে রচিত। গল্পটি আত্মকথনরীতিতে রচিত। পুলিশের খাতায় 'মোস্ট ওয়ান্টেড উইম্যান' মীরা অবশেষে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। থানায় মীরার উপর চলে পুলিশের অকথ্য অত্যাচার। মনে মৃত্যুভয় মীরার কাছে পরাজয়। লেখিকা লকাআপে বন্দী মীরার চরিত্রে অন্তঃসংলাপের দ্বারা চেতনার প্রবাহ বা steem of consciousness রীতির প্রয়োগ করেছেন। মীরার পিতা-মাতা কমিউনিস্ট দলের সঙ্গে যুক্ত ছিল। পার্টির সক্রিয় কর্মী হয়েও পিতামাতার ছয় সন্তানের জন্ম দেওয়া মীরার কাছে অপরাধ। রাজনীতিতে ব্যস্ত পিতা সংসারের প্রতি ছিল দায়িত্বহীন, গর্ভবতী অবস্থায় মায়ের বারো দিনের অনশনের কারণে মীরার দিদি বিকলাঙ্গ হয়ে জন্মায়। বিকলাঙ্গ শিশুর দায় নিতে অস্বীকার করে পিতামাতা। অথচ মীরার পিতামাতা অতিবিপ্লবের দ্বারা পৃথিবীর অসহায় মানুষদের পাশে থাকার কথা বলে-

> "যারা পৃথিবীর সমস্ত নিপীড়িত মানুষকে ভালোবাসার কথা বলে তারা নিজেদের স্ত্রীকে, বাচ্চাকে, কমরেডদের বাচ্চাকে ভালোবাসবার তাদের যত্ন নেবার কথা চিন্তা করেনি।"[৮]

মীরার কাছে অতিবিপ্লব সর্বনাশা। অতিবিপ্লব ভাবীপ্রজন্মকে সুন্দর পৃথিবী দান করতে পারে না। মীরার মতো নির্ভীক রাজনৈতিক কর্মীরা পুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদের পতন ঘটিয়ে সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের জয়ের স্বপ্ন দেখে। সেই স্বপ্নপূরণে মৃত্যু বরণেও তারা অকুতোভয়া।

জয়া মিত্রর গল্পে দেখি, পুরুষতান্ত্রিক শিক্ষায় শিক্ষিত নারীরাই স্বাধীন, স্বনির্ভরশীল হতে চাওয়া নারীদের প্রধান শত্রু। সংসারের সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে স্বল্পশিক্ষিত সংস্কারাচ্ছন্ন নারীরা নিজেদের আধিপত্য ফলায়। যুগের পর যুগ ধরে চক্রবৎ নারীর কূপমণ্ডুকতার জীবন আবর্তিত হচ্ছে। বিবাহের পর নববধূটিকে শুনতে হয় শাশুড়ির অহরহ লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, পরবর্তীকালে সেই নববধূটিই শাশুড়ি হয়ে পুত্রবধূর সঙ্গে সমরূপ ব্যবহার করে। প্রজন্মের পর প্রজন্ম মেয়েদের মধ্যে চলে আসা হীন মানসিকতাকে জয়া মিত্র ধিক্কার জানিয়েছেন 'চক্রবৎ' (১৯৯৩) গল্পে। গল্পটি আত্মকথনরীতিতে রচিত। গল্পকথক বর্তমান ও অতীতকে বিধৃত করেছেন এই গল্পে। উত্তম পুরুষের কথনে বর্ণিত গল্পে দেখি কথক বর্তমানের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে অতীত জীবনের

স্মৃতিচারণা করে। গল্পকথক কেবল অতীত জীবনের স্মৃতিচারণা করে না, বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে অতীতের ঘটনার পুনর্মূল্যায়ণ করে। যার ফলে অতীতের ঘটনার নিরীক্ষে বর্তমানের ঘটনার ঠিক ভুল বিচার করতে পারে। গল্পে দেখি, বহু বছর পর শেফালীর সঙ্গে গল্পকথকের হঠাৎ সাক্ষাৎ, গল্পকথক পূর্বে শেফালীদের বাড়ি ভাড়া থাকত। শেফালীর নাতনীর মুখেভাত অনুষ্ঠানে গল্পকথককে আমন্ত্রণ জানায়। এক মুহূর্তে গল্পকথকের মনে পুরনো স্মৃতি ভীড় করে। শেফালী তখন নববধূ। শেফালীর শাশুড়ি ছিল 'সেকেলে' চিন্তাভাবনার লোক; আধুনিক যুক্তি, বিজ্ঞানসম্মত কথাবার্তা ছিল তার কাছে হাস্যকর। সংসারের সর্বময় কর্ত্রী শাশুড়ির ভয়ে সর্বদা উৎকণ্ঠিতা থাকত শেফালী। নিজের মেয়েদের শত অপরাধ মার্জনীয় হলেও পুত্রবধূর কাজে 'পান থেকে চুন খসলেই তিনি ভয়ঙ্করী। সামান্য ভুল হলেও শেফালীকে শুনতে হতো 'অভাগীর বেটি', 'ছোটলোকের মেয়ে', 'হা-ভাত ঘরের মেয়ে' কটূক্তি। শাশুড়ির অন্যায় তিরস্কারেও শেফালী মাথা নত করেছে। সেই লাজুক, ভীতু, সর্বংসহা নববধূ শেফালী আজ তার পুত্রবধূর শাশুড়ি। শাশুড়ির সমস্তগুণ শেফালী অর্জন করেছে; সামান্য ভুলত্রুটিতে নববধূটিকেও শুনতে হয় শেফালীর তর্জন-গর্জন, কটূক্তি-

> "নিজে যেমন হাভাতে ঘরের মেয়ে সেইরকম ভাবনাচিন্তা। উৎসবের দিনে পাঁচটা লোক আসছে, বাচ্চার গয়নাগাঁটি দেখবে-এইসব জ্ঞানগম্যির শিক্ষা তোমার মা-বাপ তোমারে দেয় নাই সে আমি খুব জানি। নবাবের বেটির মতো যাও কোথায়, এদিকে আসো।"[৯]

সময়ের সঙ্গে শেফালী নিজেকে শশুড়ির আদলে গড়ে তুলেছে। গল্পের শেষ লাইনে লেখিকা সমাজের বুকে কশাঘাত করেছেন- "আর একটি মেয়েকে কোলে নিয়ে এই মেয়েটি আমার পায়ের নীচে নিচু হবার চেষ্টা করে।"[১০] চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ সংকীর্ণমনা নারীদের হীন মানসিকতা চক্রবৎ আবর্তিত। শিক্ষা ও উন্মুক্ত চিন্তাভাবনায় নারীর গণ্ডিবদ্ধ আবর্তনের বৃত্তকে চূর্ণবিচূর্ণ করতে পারে।

সমাজিক বা পারিবারিক পরিস্থিতির চাপে অসহায়, নিরুপায় নারীর জীবন উঠে এসেছে জয়া মিত্রর গল্পে। সমাজের গতানুগতিক নিয়মের বেড়াজালে নারীরা সহজেই বাঁধা পড়ে, সেই জাল থেকে নারীর পরিত্রাণ নেই। 'দ্রৌপদী' (১৯৮৭) জয়া মিত্রর প্রতিনিধিস্থানীয় গল্প। সৃষ্টির প্রারম্ভকাল থেকেই নারী পণ্যবস্তু। যুগে যুগে দ্রৌপদীরা পরিবারের আত্মস্বার্থপূরণের পণের সামগ্রী। আমাদের সমাজে সীতারা বারবার অগ্নিপরীক্ষা দেয়, দ্রৌপদীদের করা হয় উলঙ্গ। লেখিকা দেখাতে চেয়েছেন, একবিংশ শতাব্দীতে নারী এখনো দ্রৌপদী সম। গল্পে দেখি, দুর্ঘটনায় বাপ-দাদার মৃত্যুর পর পরিবারের সকল দায়িত্ব নেয় জামাই রবি। পরিবারে সংকটের কালোমেঘ ঘনিয়ে আসে বড় দিদির মৃত্যুতে। রবি পুনরায় বিবাহ করলে হয়তো পরিবারের দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করবে অথবা নববধূর কাছে অপমানিত হবার আশঙ্কায় বাড়ির সকলেই আতঙ্কিত। আসন্ন বিপদ থেকে পরিবারটি উদ্ধার পেতে বাড়ির ছোট মেয়ে ঝুমলাকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করে। ঝুমলার সঙ্গে জামাইবাবু রবির বয়সের বিস্তর ব্যবধান। ঝুমলা ছোট থেকে জামাইবাবুর সঙ্গে দাদার মতো মিশেছে, সম্মান করেছে। সেই মানুষটির সঙ্গে বিবাহ, একই বিছানায় যৌনমিলন অকল্পনীয় ঝুমলার কাছে। কিন্তু পরিবার পরিস্থিতির চাপে ঝুমলা বাধ্য হয় রবিকে স্বামী হিসেবে মেনে নিতে। লেখিকা গল্পের শেষ লাইনে ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করেছেন- "আমার ঠিক পিছনেই সাদা দেওয়াল। আমি জানি।"[১১] দেওয়াল বোঝায় সীমাবদ্ধতাকে। ঝুমলা জানে তার পিঠ দেওয়ালে ঠিকে গেছে সেখান থেকে পালানোর উপায় নেই। আত্মস্বার্থসাধনে সম্পর্কের মূল্যবোধের, মানবিকতার সংকট অবক্ষয়িত সমাজের দিকটিকে জানান দেয়।

পৌরুষতান্ত্রিক আধিপত্য, ক্ষমতাধরদের বিরুদ্ধে একা নারী বড্ড অসহায়। 'লোকশিক্ষা' (১৯৯৭) গল্পে স্বামী ও কন্যা নিয়ে দুর্গার ছোট্ট পৃথিবী। সাংসারিক বুদ্ধিতে নিপুণা দুর্গা সকলের কাছে সৎ, স্পষ্টবক্তা, প্রতিবাদী হিসেবে পরিচিত। স্বামীর স্বল্প উপার্জন সঞ্চয় করে দুর্গা নিজস্ব বাড়ি কেনে। এই বাড়িকে কেন্দ্র

করেই পাড়ায় রাজনৈতিক নেতা, জমি মাফিয়া বীরেনের সঙ্গে ঝামেলার সূত্রপাত। বীরেন চেয়েছিল দুর্গার বাড়ি কিনে প্রাসাদপ্রাঙ্গণ গড়তে। বীরেনের স্বপ্ন ব্যর্থ হয় দুর্গার প্রতিবাদে। কেবল তাই নয়, বীরেনের স্ত্রীর লোকদেখানো শিশু উন্নয়ন সমিতির মিছিলের ভণ্ডামিকে দুর্গা প্রতিবাদ করেছে –

> "তা ছাড়া তোর মাকে বলবি রাস্তায় শিশু শ্রমিকের মিছিল করলেই হয় না, লোকের ছেলেগুলোকে পেটভাতায় বাড়িতে খাটায় পেটভরে দুটি খেতে দেয় না অষ্টপ্রহর গালি দিচ্ছে – সেগুলোর সঙ্গে একটু মানুষের মতো ব্যবহার করতে শিখুক আগে।"[১২]

আত্মসম্মানে ঘা দেওয়া দুর্গাকে শিক্ষা দিতে বীরেন তাকে ধর্ষণ করে-

> "বীরেন তার বস্ত্রহীন শরীর জাপটে ধরে গালের ওপর দুপাটি দাঁত বসিয়ে দিয়েছে। তার সঙ্গীরা হাসছে হ্যা হ্যা করে। রক্তসুদ্ধ থুতু ফেলে বীরেন দুর্গার শরীরটাকে ঠেলে মাটিতে ফেলে দেয়।"[১৩]

দুর্গার এমন শোচনীয় অবস্থাতেও নির্বাক জনগণ। বর্তমানে দুর্গারা ক্ষমতাধর, কামান্ধ, নারীলোলুপ অসুরদের কাছে পরাজিত।

সভ্যতার অগ্রগতি হলেও পুরুষতান্ত্রিক সমাজের ভাবনা সেকেলে, স্থবির। স্বাধীনতার এত বছর পরেও নারীর সবৈব মুক্তি হয়েছে কিনা তা আমাদের প্রশ্নচিহ্নের মুখে দাঁড় করায়। 'স্বাধীনতার যমজ' (১৯৯০) গল্পে সুখবিন্দরের জন্ম হয় পনেরো আগস্ট। বাবা-মা ভালোবেসে নাম রেখেছিল আজাদ কউর। নারীর নামে স্বাধীনতাকে মেনে নেয়নি ঠাকুমা, 'আজাদ' পরিবর্তে নাম রাখে সুখবিন্দর। সুখবিন্দরের বিবাহ ঠিক হয় তিন ছেলেমেয়ের পিতা, বিপত্নীক মধ্যবয়সী পুরুষের সঙ্গে। আশ্চর্যের বিষয় মেধাবী, প্রতিবাদী, শিক্ষিকা সুখবিন্দর বিনা আপত্তিতে এই বিবাহ মেনে নেয়। কারণ, তার বাপ-দাদারা এই বিবাহ স্থির করেছে-

> "পরিবারের বড়দের অবাধ্য হওয়া নাকি একেবারে অসম্ভব ওদের মধ্যে। ওদের সমাজে কিছু নির্দিষ্ট রীতিনীতি আছে, সেগুলো না মানলে সমাজের মধ্যে থাকা যায় না।"[১৪]

স্বনির্ভরশীল নারীও সমাজ-পরিবারের কাছে কলের পুতুল। গল্প এগোলে দেখি কোন এক অজানা কারণে সুখবিন্দরের বিবাহ ভেঙে যায়। তার বিবাহ হয় সুদর্শন যুবক, আই.পি.এস অফিসারের সঙ্গে। দাম্পত্যজীবনে চরমসুখী গর্ভবতী সুখবিন্দর মাতৃত্বের জন্য উদগ্রীব। প্রসবযন্ত্রণায় অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের কারণে সুখবিন্দরকে বাঁচানো গেলেও তার শিশুটি মারা যায়। প্রাণে বাঁচলেও সুখবিন্দর চিরদিনের মতো জননী হওয়ার স্বপ্ন অপূর্ণ থেকে যায়। শ্বশুরবাড়ি ছেলের দ্বিতীয় বিবাহের জন্য পাত্রীর সন্ধান করে, কারণ বন্ধ্যা নারী পুরুষতান্ত্রিক সমাজে কেবল বোঝা-

> "ওর শ্বশুরবাড়ি মেয়ের খোঁজ করছে, ছেলের বিয়ে দেবে। অফলা গাছের মত বাঁজা বৌ সংসারের অলক্ষণ, সুখবিন্দরকে আর দরকার নেই তাদের।"[১৫]

একজন আই.পি.এস অফিসারের মতো শিক্ষিত ব্যক্তির কাছে বন্ধ্যা নারী কেবল 'ঝঞ্ঝাট'। সুখবিন্দর বিবাহ বিচ্ছেদ চায়নি। প্রথম স্ত্রীর বর্তমানে আই পি এস অফিসারের দ্বিতীয় বিবাহ সমাজের কাছে গর্হিত কাজ। পথের কাঁটাকে দূর করতে শাশুড়ির বিষ মেশানো খাবার পোষা কুকুর খাওয়ায় মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পায় সুখ। এই অন্যায়ের পরেও সুখবিন্দর পুলিশের কাছে অভিযোগ করেনি, কারণ সমাজে তার বাপ-দাদার সম্মান আছে, আদালতের চক্কর কাটলে সম্মানহানি হবে। নারী সমাজ ও পরিবারের জটিলতার শৃঙ্খলে এমনভাবে আবদ্ধ যে প্রতিবাদ করলে তাদের পায়ে বাঁধা শিকল ঝনঝনিয়ে ওঠে।

জয়া মিত্র বারবার পুরুষতান্ত্রিক সমাজকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন। 'খেয়া' (১৯৯৪) গল্পে সাগরময়ীর বিবাহ হয় তার থেকে সাতাশ বছরের বড় বিপত্নীক তিন ছেলেমেয়ের পিতার সঙ্গে। স্বামীর প্রথম পক্ষের বড়

ছেলে চার বছরের, মেজ ছেলে দুই বছরের বড় এবং মেয়েটি সমবয়সী। সম্পর্কের অদ্ভুত অস্বস্তি কিছুদিনের মধ্যে কাটিয়ে উঠলেও সাগরময়ীকে চরমলজ্জা ঘিরে ধরে যখন সে এবং বড় ছেলের বৌ একসঙ্গে গর্ভবতী হয়-

> "তবু একটা লজ্জার কথা খুব ভিতরে কোথায় যে অস্বস্ত ঠিক যখন প্রায় একই সঙ্গে গর্ভিণী হতেন দুজনে। সৌরভী যে ছেলের বৌ। সেই ছেলের সামনে মাকেও যখন ভারী শরীর নিয়ে চলাফেরা করতে হয়, বড় লজ্জা হত। অথচ পুরুষমানুষ কেন বোঝে না? তাদের লজ্জা হত না? তারাও তো বাবা আর ছেলে?"[১৬]

পুরুষমানুষের লজ্জা হয় না, আসলে পিতা হোক বা পুত্র নারীশরীরলোভী পুরুষরা চায় কামচরিতার্থ করতে। নারীর মনে অবগাহন করে নারীর মর্মবেদনাকে উপলব্ধি করার ক্ষমতা নেই কামলোলুপ পুরুষের।

জয়া মিত্রর গল্পে প্রাধান্য পেয়েছে নারীজীবন। পরিবর্তিত সময়ের সঙ্গে বদলেছে নারীর জীবন। বর্তমান সময়ে অনেকক্ষেত্রে নারীর উন্নতি হলেও, এখনো বহু নারীর জীবন তিমিরাচ্ছন্ন। প্রগতিশীল, স্বাধীন, স্বনির্ভরশীল নারীর পাশাপাশি পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বিধিনিয়মের নাগপাশে বন্দী নারীজীবন চিত্রিত হয়েছে জয়া মিত্রর গল্পে। তাঁর গল্পের নারীরা সময় ও সমাজের প্রতিবন্ধকতাকে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে উত্তরণের কথা বলে।

তথ্যসূত্র:

১. মিত্র, জয়া। শ্রেষ্ট গল্প। দি সি বুক এজেন্সী, প্রথম প্রকাশ-১৯৯১, কলকাতা-০৭, পৃ. ৫০।
২. তদেব, পৃ. ৫২।
৩. মিত্র জয়া। গল্পসমগ্র। পুনশ্চ, প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারী ২০১৮, কলকাতা-১০, পৃ. ৬৯।
৪. তদেব, পৃ. ৭৩।
৫. মিত্র জয়া। শ্রেষ্ট গল্প। দি সি বুক এজেন্সী, প্রথম প্রকাশ-১৯৯১, কলকাতা-০৭, পৃ. ১৩৭।
৬. তদেব, পৃ. ১৭৩।
৭. তদেব, পৃ. ১৮২।
৮. তদেব, পৃ. ১৫৪।
৯. তদেব, পৃ. ৩২।
১০. তদেব, পৃ. ৩২।
১১. মিত্র, জয়া। কাল পরশুর ধারাবাহিক। করুণা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ বইমেলা- ১৯৯৮, পৃ. ৮১।
১২. তদেব, পৃ. ৪৫।
১৩. তদেব, পৃ. ৪৯।
১৪. তদেব, পৃ. ৩৪।
১৫. তদেব, পৃ. ৩৫।
১৬. মিত্র, জয়া। শ্রেষ্ট গল্প। দি সি বুক এজেন্সী, প্রথম প্রকাশ-১৯৯১, কলকাতা-০৭, পৃ. ১২৮।